মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
নভেম্বর ২১, ২০০৫, সোমবার : অগ্রহায়ণ ৭, ১৪১২

অনির"দ্ধ আহমেদ ।। আওয়াজ তুলুন : ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করো

এক.
আরো একবার বিক্ষত হলো বাংলাদেশের সমাজদেহ। বাংলাদেশের হৃদয় থেকে ঘটলো রক্তক্ষরণ। দুজন তর"ণ বিচারক, যাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সমান্তরালে বহমান থাকতো দেশেরও ভবিষ্যৎ, তাদের অকালে প্রাণ দিতে হলো আত্মহননে উদ্যোগী এক ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী তর"ণের আচমকা আক্রমণে। এই ক্ষত, এই ক্ষতি গোটা জাতির। সন্ত্রাসের কাছে পণবন্দী হয়ে রয়েছেন প্রধান থেকে পাতিমন্ত্রীরা সকলেই, পণবন্দী করা হয়েছে জনগণকে।
আপাতদৃষ্টিতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গের পর সরকারের যে সক্রিয়তা লক্ষ করা গেছে, তাতে খুব যে একটা সুফল পাওয়া যাচ্ছে তা নয়। 'ক্রসফায়ারে' নিহত কোনো ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীর নাম আমরা এখনো শুনিনি। বহু ইসলামি জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে বটে, সরকার কয়েকটি ইসলামি চরমপন্থী দলকে নিষিদ্ধও ঘোষণা করেছে কিন" তাতে তাদের সন্ত্রাস হ্রাস পায়নি একটুও। সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চলছে, সুনির্দিষ্ট বিরতির পর পর। গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গি তর"ণ মামুন স্বীকার করেছে ধর্মীয় সন্ত্রাসের সঙ্গে তার সংশিষ্টতার কথা, আত্মহননের এই পথ ঐ সম্ভাবনাময় তর"ণ কেন গ্রহণ করলো, কী তার দুঃখ একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে, ইসলামের জন্য শহীদ হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছে এই তর"ণ যার সামনে ছিল অসাধারণ এক সম্ভাবনা। সম্প্রতি এমনি এক ঘটনা লক্ষ করি জর্ডানেও। ৩৫ বছর বয়সী এক গৃহবধূ স্বামীকে নিয়ে আত্মঘাতী আক্রমণ চালাতে গিয়েছিল, পশ্চিমীদের বির"দ্ধে। স্বামী শেষ পর্যন্ত তার কথিত মিশন সম্পন্ন করে মারা গেলো, প্রাণে রক্ষা পেলো স্ত্রীটি। শহীদ হওয়ার 'সুবর্ণ সুযোগ' থেকে বঞ্চিত হলো ঐ আত্মহননে উদ্যোগী নারী। এই মানসিকতা সুস্থ নয়, এর মধ্যে রয়েছে এক ধরনের স্পষ্ট বিকৃতি। ধর্মীয় আদর্শও যে এ ধরনের বিকৃত মানসিকতার জন্ম দিতে পারে, অপরাধীচক্র সৃষ্টি করতে পারে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হাল আমলের বাংলাদেশের এবং অন্যত্রও। সন্ত্রাসী আক্রমণে অন্য আর ১০ জনের প্রাণহানি নিশ্চিদ্রভাবে নিশ্চিত করার জন্যই আত্মহননের এই প্রক্রিয়াকে বেছে নিচ্ছে ঘাতকরা। সমস্যা হলো এরা তো কেবল নিজেরাই মরছে না, মারছে অগণিত অসহায় মানুষকে। শুনতে পাচ্ছি বাংলাদেশেও নাকি এ রকম হাজার দুয়েক আত্মঘাতী আক্রমণকারী আত্মগোপন করে আছে এবং এদের অনেকেই আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সরকার নাকি এদের একটি তালিকা প্রণয়নের জন্যও আদেশ দিয়েছে বলে পুলিশের মহাপরিদর্শক সাংবাদিকদের বলেছেন।
সরকারের নিজের অস্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ায় এখন তৎপর হয়েছে এরা, নইলে প্রথম দিকে তো এ সব ঘটনাকে প্রচার

মাধ্যমের অপপ্রচার এবং সরকারকে হেনস্তা করার জন্য বিরোধী দলের কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেছে চারদলীয় জোট সরকার। এখন অন্তত ঐ জোটের প্রধান শরিক বিএনপি উপলব্ধি করছে যে তাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিচ্ছে তাদেরই সহযোগী দলগুলো, তাদেরই সহমতাদর্শীরা। বিএনপি কি তাদেরকে এখনো নিজেদের নির্বাচনী শক্তির অংশ হিসেবে মেনে নেবে, না কি নির্বাচনের জন্য একটি বড়ো দায় মনে করবে, সেটা দেখার বিষয়। এই তো সেদিন খালেদা জিয়া বললেনই যে চারদলীয় জোটে কোনো ভাঙন ধরবে না। তার এই বক্তব্যে স্পষ্টই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসলামি মৌলবাদীদের প্রতি তার দলের যে দুর্বলতা রয়েছে আজন্ম এবং যাদের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করেছেন ২০০১ সালে সেই গাঁটছড়া তিনি খুলতে রাজি নন। কিন্' বিএনপির অন্যপক্ষ মনে করে যে এবার সময় এসেছে জামাতে ইসলামীর সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রচনার। কাজেই দলের মধ্যেই দুধরনের মতবাদ রয়েছে এবং রয়েছে স্পষ্ট মতভেদও। কিন্' এখন সমস্যাকে দেখতে হবে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্বাচনী গণিতের ঊর্ধ্বে উঠে, কারণ সমস্যার যে ব্যাপকতা তার রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক দিক রয়েছে। বিএনপি দলীয়ভাবে এই সমস্যাকে সামাল দিতে পারবে বলে মনে হয় না।

দুই.

প্রকৃত সমস্যাটি কেবল সন্ত্রাসের নয়। সন্ত্রাস হচ্ছে উপায়, প্রাণহানি হচ্ছে ফলাফল কিন্' এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ ও রাজনীতিতে ইসলাম ধর্মের অযাচিত প্রভাব বিস্তার। এই সন্ত্রাসের পেছনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডারভিত্তিক এই সব গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। বিচারকদের হত্যা করার পেছনেও তাদের যুক্তি হচ্ছে, এই বিধর্মী আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে, ইসলামি আইন প্রণয়ন। এ রকম লক্ষ্যকে সামনে রেখে আত্মঘাতী আক্রমণের তেমন উলেখযোগ্য দৃষ্টান্ত অন্যত্র পাওয়া মুশকিল। ফিলিস্তিন বা ইরাকে যারা এই আক্রমণ চালাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রিক ব্যাপারে পরিবর্তন আনা, ধর্ম সেখানে বাহ্যত মুখ্য নয় এবং তাদের আপত্তি বিদেশী শক্তির বির"দ্ধে। বাংলাদেশে আত্মঘাতী আক্রমণের এই নতুন পদ্ধতি যেমন এখানকার সন্ত্রাসীদের এখন বিশ্বের অন্যত্র যে সব ইসলামি চরমপন্থী রয়েছে তাদের সঙ্গে একাত্ম করলো অন্যদিকে তেমনি আবার বাংলাদেশ ইসলামি মৌলবাদী সন্ত্রাসের পেছনের কারণ সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয়, সেখানে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কিংবা বিদেশী শক্তির অবস্থানের বির"দ্ধে প্রতিবাদের কোনো প্রসঙ্গ নেই। এ জন্যই বাংলাদেশের ভেতরের এই সন্ত্রাসের প্রকৃতি যদিও বিশ্ব সন্ত্রাসের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ– এর লক্ষ্য পুরোপুরি এক নয়। বাংলাদেশের আক্রমণকারীরা স্পষ্টতই এই স্বাধীন দেশের সরকারকে ইসলামি আইন প্রণয়নে বাধ্য করার জন্য এ ধরনের আক্রমণ চালাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থাকে যদি সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করে দেওয়া যায় এবং ভীতসন্ত্রস্ত বিচারকরা যদি বর্তমান আইনের আওতায় তাদের বিচার কাজ বন্ধ করে দেন, তাহলেই সফল হবে ঐ চরমপন্থী ইসলামি সংগঠনগুলো এবং ভেঙে পড়বে সরকারের মূল কাঠামো। সেদিন টেলিভিশনে দেখলাম একজন অসহায় বিচারক বলছেন তারা নিরূপায়। সরকার যদি সংসদে ইসলামি আইন পাস করিয়ে নিয়ে আসে, তাহলে তারা সেই আইনের আওতাতেই বিচার করবেন। বিষয়টি রাজনৈতিক, বিচার বিভাগীয় নয়। বিচারকের ঐ বক্তব্যে ভুল ছিল না একটুও কিন্' তাতে বিপদের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে, বিশেষত যখন সরকারের ভেতরেই মুসলমান মৌলবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিচারকদের প্রতি সম্প্রতি বিষোদগার করেছেন ক্ষমতাসীন বিএনপিরই কিছু নেতানেত্রী। তারা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে বিচারক যে রায় দিয়েছেন, তার বির"দ্ধে কটু কটাক্ষ করেন। লক্ষ করার বিষয়, এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটানো হচ্ছে যখন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের বিলম্বের জন্য সর্বোচ্চ আদালত সরকারকে ভর্ৎসনা করেছে। এই সন্ত্রাসী আক্রমণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নকে অনেকখানি পিছিয়ে দিলো। পর্যবেক্ষকরা কেউ

কেউ বলেন যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিলম্বিত করতে এই সন্ত্রাসী আক্রমণের সদর্থক ভূমিকা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

তিন.

সন্ত্রাসের বির"দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার যদি ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখে, তাহলে তা হবে গোড়ায় জল দিয়ে, আগা কাটার মতোই বিষয়। তাতে মৌলবাদের ঐ বৃক্ষ আরো ফলবতী হয়ে উঠবে, শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি লাভ করে রাষ্ট্রকে আচ্ছাদিত করবে নিশ্চিত অন্ধকারে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটাই পথ আছে, আর তা হলো জামাতে ইসলামীসহ সকল ধর্মীয় রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। বাংলাদেশে সার্বিকভাবে ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করার এর চেয়ে বড়ো উপায় আর কিছুই নেই। আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্' বাংলাদেশের প্রথম সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় গিয়ে তার আওয়ামীবিরোধী রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার স্বার্থে বহুদলীয় গণতন্ত্রের গালভরা বুলি আওড়িয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে অবাধে রাজনীতি করার অনুমতি দেন এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামাতে ইসলামী তখন থেকেই রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, জামাতে ইসলামী তো সন্ত্রাসী দল নয়, তারা গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি মেনে চলেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এবং বর্তমানে সরকারের শরিক দলও বটে। বস্'ত পশ্চিমেও জামাতের সাথী ও সমর্থকরা এ রকম ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, জামাত গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় যেতে চায় এবং ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার যে কথা জামাত বলে থাকে, তাতে দোষেরই বা কী? তাহলে জামাতের বির"দ্ধে বক্তব্য রাখা কতোখানি ন্যায়সঙ্গত? বস্'ত জামাতের এই নির্দোষ ভাবমূর্তি যে একেবারে বাহ্যিক সে কথা বলাই বাহুল্য।

চার.

ক্ষমতা লাভের পর জামাত যে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, মানবিক গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করে ইসলামি দলভিত্তিক, শরিয়া অনুবর্তী সীমিত গণতন্ত্র (?) চালু করবে সে কথা বোঝার জন্য খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন নেই। সত্য বটে জামাত বাহ্যত ১৯৭১ সালের পর থেকে কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অংশ নেয়নি, যদিও তার ছাত্রশাখা কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে ক্ষমতাসীন হওয়া মাত্রই। তবে সার্বিকভাবে জামাত গোটা সময়টুকুই ব্যয় করেছে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিজেদের পুনর্বাসিত করতে। মনে করা হচ্ছে, সেনাবাহিনীসহ দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, আমলা, বিচার বিভাগ, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী– এদের মধ্যে জামাতে ইসলামী তার আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যাতে শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতাগ্রহণের পর তাদের প্রশাসন পরিচালনা হয় নির্বিঘ্নে। বর্তমান সরকারের শরিক দল হিসেবে ক্ষমতার সুযোগ ভোগ করায় জামাতে ইসলামী দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রথম সরকারি দলের অন্তর্ভুক্ত হলো। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব অনেকখানি। বরঞ্চ এর বিপরীতটাই সত্য। ১৯৭১ সালে পরিকল্পিতভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার হোতা এই জামাতে ইসলামীর হাত থেকে রক্তের দাগ এখনো মুছে যায়নি। জামাতের বর্তমান নেতৃস্থানীয় অনেকেই তখন তর"ণ সদস্য হিসেবে স্বাধীনতাকামী বাঙালির বির"দ্ধে যে নির্যাতন চালিয়েছে সেটা সকলেরই জানা। সরকারি দলের শরিক হলেই সেই পাপ নিজ থেকে স্খলিত হয় না। আর যে আদর্শিক কারণে জামাত ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইয়ের সক্রিয় বিরোধী ছিল, সেই একই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার কথা জামাতের ঘোষণপত্রে রয়েছে এবং ইসলামি সন্ত্রাসী দলগুলোর বক্তব্য ও প্রচার পুস্তিকায়ও

আছে। কাজেই ইসলামি আইন চালু করার দাবি নিয়ে এই জঙ্গি সংগঠনগুলো যখন আক্রমণ চালায় বিচার বিভাগের বির"দ্ধে, তখন অন্তত আদর্শিক সাযুজ্যের কারণেই জামাত নেতারা নীরব থাকেন। নিজামী এক সময়ে বাংলাভাইয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরের মতো। পরে দিকভ্রান্ত হয়ে এই সব ইসলামি জঙ্গি তৎপরতার জন্য ইসরায়েল ও ভারতের গোয়েন্দা বিভাগকে তিনি দায়ী করেন। অথচ না নিজামী, না সাঈদী কেউই এই হনন প্রক্রিয়ার পরিষ্কার নিন্দা জানাননি। জানানোর কথাও নয় কারণ তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন, ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত করা– যার আওতায় থাকবে ইসলামি বিচার বিভাগ।

পাঁচ.

এই অশুভ তৎপরতা বন্ধ করার জন্য এখনই প্রয়োজন ১৯৭২ সালের সংবিধানের সেই সব ধারার পুনর্জীবন যেখানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। মূলত বাংলাদেশে এখনকার এই সন্ত্রাসের পেছনে এই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আদর্শবাদ অতিমাত্রায় কার্যকর। সন্ত্রাসীদেরকে এই তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত না করতে পারলে বাংলাদেশে এ ধরনের সন্ত্রাসের অবসান ঘটা খুব সহজ নয়। সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত গণমাধ্যমেই একথা এখন বলার সময়ে এসেছে যে ধর্মকে রাজনীতিতে প্রয়োগ করার অপচেষ্টায়, ধর্ম ও রাজনীতি উভয়কেই কলুষিত করবে নিঃসন্দেহেই। ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছিল সে বিষয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন যে, এই ধর্মনিরপেক্ষতা পশ্চিমের সেকিউলিয়ারিজম থেকে ভিন্ন, এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্মহীনতা নেই, আছে সকল ধর্মের সমান ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ধর্মের প্রভাব সেখানে থাকবে ব্যক্তি মানুষের জীবনে, কিন্' এর কোনো প্রতিপত্তি থাকবে না রাজনৈতিক জীবনাচরণে। অনেকেই হয়তো মন্তব্য করবেন যে, ইউরোপে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও তো রাজনীতিকে ধর্ম প্রভাবিত করে, তাহলে বাংলাদেশে করবে না কেন? এই প্রশ্ন অতিসরলাকৃত কারণ পশ্চিমে ধর্ম নির্বাচনে যেটুকু প্রভাব বিস্তার করে, তার ভিত্তি ভ্রূণহত্যা, আদিকোষ (স্টেম সেল) গবেষণা, কিংবা সমকাম বিষয়ে কিছু গুর"ত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্নে বিভিন্ন দলের অবস্থান। সেখানে এক ধর্মের অনুসারীরা গোটা রাষ্ট্রের ওপর ধর্মীয় প্রতিপত্তি বিস্তারের আদৌ কোনো চেষ্টা করে না। জার্মানির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নাম শুনে যদি বাংলাদেশের কোনো মৌলবাদী দল আহ্লাদিত হয় যে ঐ তো জার্মানিতে খ্রিস্টান মৌলবাদ বিস্তৃত হচ্ছে, তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে কারণ সেখানকার নির্বাচনের জয় পরাজয় স্থির হয়েছে অর্থনৈতিক এজেন্ডার ভিত্তিতে। তাছাড়া পশ্চিমের জনসাধারণের মধ্যে এক ধরনের স্বতস্ফূর্ত সচেতনতা রয়েছে যা তাদের চিন্তা চেতনায় ভারসাম্য রক্ষা করে। বাংলাদেশ কিংবা ইরানের কোনো ইসলামি দলের সমতুল্য নয় পশ্চিমের কথিত ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো। রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে একটি স্বাভাবিক পার্থক্য কার্যত ক্রিয়াশীল সে সব দেশেও, যেখানে চার্চকে সম্মান জানানো হয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেখানে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভাজন ও বিভেদ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে।

ছয়.

বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই এক মহাসমাবেশের আয়োজন করতে যাচ্ছে। অনুমান করছি সেই সমাবেশ থেকে সরকারের কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করা হবে। আয়োজকরা নিশ্চয়ই এটা এখন উপলব্ধি করেন যে, ইসলামি চরমপন্থা বাংলাদেশের অস্তিত্বের বির"দ্ধে একটা বড়ো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হুমকি সমূলে উৎপাটন ছাড়া বাংলাদেশে কোনোক্রমেই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু হতে পারে না। ঐ সমাবেশে উপস্থিত দলগুলোর এখন প্রধান দাবি হওয়া উচিত বাংলাদেশে ১৯৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী সকল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে

নিষিদ্ধ করতে হবে এবং ক্ষমতাসীন দল থেকে ধর্মভিত্তিক দুটি শরিক দলকে বহিষ্কার করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত ১৯৭২ সালের সংবিধানের সুনির্দিষ্ট ধারাগুলো পুনর"জ্জীবিত করার জন্য সংসদে সরকারি দলের যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। এই পদক্ষেপে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ সকল দলের সাংসদ নিঃসন্দেহেই সরকারকে সমর্থন দেবেন। বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে একটি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারণের ওপর, যে নিরাপত্তা এখন বিঘ্নিত, বিচারকরা যেখানে ভীতসন্ত্রস্ত সেখানে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা চলতে পারে না। সার্ক সম্মেলনের ব্যয়বহুল নিলর্জ্জ আলোকসজ্জার অন্তরালে যে অন্ধকারের দিকটি আমাদের সমাজের ভেতরেই বিস্তৃত হচ্ছে, সেখানে শিক্ষা ও সচেতনতার আলোর মশাল পৌঁছে দেওয়ার সময় এসেছে। লক্ষ করি বাংলাদেশে এক ধরনের আশ্চর্য ধরনের ঔদাসীন্য বিস্তার করছে এ সব ব্যাপারে। বসুন্ধরা শপিং কমপেক্সের চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য, বাঙালিদের ভুলিয়ে দিয়েছে যে বস"ত সমাজের অন্ধকারের দিকটিই বিস্তৃত হচ্ছে ধীরে ধীরে ধর্মীয় মৌলবাদের হাত ধরে। অথচ সেটা এখন কোনো গোপন কথা নয়। উগ্র ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীরা এখন পরিষ্কার করেই বলছে, তাদের উদ্দেশ্যের কথা, কাজেই এ নিয়ে সরকারেরও কোনো রাখঢাকের অবকাশ নেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম ধর্মের বির"দ্ধে নয়, কিন" ধর্মের রাজনীতিকরণের বির"দ্ধে। যারা আজকাল খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন যে, ইসলাম তো সন্ত্রাসের কথা বলে না, কিছুসংখ্যক বিপথগামী মানুষ এ সব করছে, তারা বিষয়টিকে হালকাভাবে নেন। ইসলাম সন্ত্রাসের কথা নাই-ই বললো, কিন" সন্ত্রাসীরা তো ইসলামের কথাই বলছে, কুরআন-হাদিস থেকে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে তাদের কাম্য কট্টর শরিয়া আইন। অতএব, সমস্যার একেবারে মূলে আসতে হবে। সন্ত্রাস দমনের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর হবে কিন" যেমনটি একজন বিচারক বলেছেন যে, সমস্যাটি রাজনৈতিক। বস"ত তিনি ঠিকই বলেছেন। বিচারকদের সশস্ত্র পাহারাদার দিয়ে, দেহরক্ষী দিয়ে সমাজদেহকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। সন্ত্রাস কিছু লক্ষ্য অর্জনের উপায় কেবল, আসলে আঘাত হানতে হবে সেই লক্ষ্যের প্রতি যা বাংলাদেশকে অমানিশার অন্ধকার নিয়ে যাবে। বাংলাদেশ সরকারকে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে যে, বাংলাদেশে ইসলামি আইন চালুর কোনো অবকাশ নেই। বিদ্যমান আইনের আওতায় দেশ পরিচালিত হবে। গণতন্ত্র ও জনগণের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনো আপোস করা হবে না। আবার স্লোগান উঠুক : যার ধর্ম তার কাছে, রাষ্ট্রের কী বলার আছে।

অনির"দ্ধ আহমেদ : আমেরিকা প্রবাসী সাংবাদিক।

This page has been printed from the web site of The Daily Bhorer Kagoj (www.bhorerkagoj.net).
URL: http://www.bhorerkagoj.net/news.php?id=16414&sys=3

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com)